Rajshahi University journal of arts & law **ISSN 2309-0898 (Print)**
Vol. 54, Issue 1 (2026), pp. 93-117 **ISSN 2408-8773 (Online)**
DOI: https://doi.org/10.64102/rujal.0724

কাজী নজরুল ইসলাম, লাঙল ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন: একটি পর্যালোচনা
[Kazi Nazrul Islam, Langal and the Communist Movement in Bengal: A Review]

সেখ আসরাফ আলি*

Abstract

Langal, a weekly magazine edited by Kazi Nazrul Islam, played a pivotal role in the early communist movement in Bengal. Established in 1925 as the mouthpiece of the *Labour Swaraj Party*, *Langal* was the first publication in undivided Bengal to promote communist ideology openly. It became a powerful platform for advocating workers' and peasants' rights, social justice, and anti-colonial resistance. This paper examines *Langal*'s contributions to Bengal's leftist politics, analyzing its key publications, editorial stance, and impact on the growing communist movement. The magazine published translations of Marxist literature, discussions on class struggle, and critiques of British imperialism. Through *Langal*, communist ideals reached a broader audience, influencing political discourse and mobilizing the working class. By tracing the magazine's history, this study highlights its significance as an intellectual and ideological force in shaping Bengal's early communist movement.

***Keywords*:** Undivided Bengal, Communist movement, Editor, Class, Bolshevik revolution.

ভূমিকা

বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা ১৯২০ -এর দশকে রুশ বলশেভিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ ছিল না, বরং শ্রমিক-কৃষকের অধিকার, শ্রেণী বৈষম্যের অবসান এবং সাম্যবাদী দর্শনের প্রচারে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যিনি কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় ছাড়িয়ে রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে উঠে এসেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'লাঙল' (১৯২৫) অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ্য প্রচার মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, যা লেবার স্বরাজ পার্টির মুখপত্র ছিল এবং পরবর্তীতে ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টির সাথে যুক্ত হয়।

এই প্রবন্ধে 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে নজরুলের রাজনৈতিক সক্রিয়তা, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপ এবং বাংলার বামপন্থী রাজনীতির বিকাশকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মার্কসবাদী সাহিত্যের অনুবাদ, শ্রেণী সংগ্রামের আলোচনা এবং ব্রিটিশ শোষণের সমালোচনার মাধ্যমে পত্রিকাটি কিভাবে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা বিশদভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। এর ফলে বুঝতে পারা যায় যে, নজরুলের সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক প্রয়াস বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে একটি দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করেছিল, যা পরবর্তীকালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল।

* এমফিল ফেলো, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ;
E-mail: asrafalisk94@gmail.com

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত লাঙল পত্রিকার মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা ও বিকাশ পর্যালোচনা করা, বিশেষ করে নজরুলের রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং শ্রমিক-কৃষকের অধিকার প্রচারে এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। এছাড়া পত্রিকার সম্পাদকীয় অবস্থান, মার্কসবাদী সাহিত্যের প্রচার এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনার মাধ্যমে বাংলার বামপন্থী রাজনীতির প্রাথমিক ধাপগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরা।

গবেষণা পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক উৎস যেমন 'লাঙল' পত্রিকার সংখ্যা, ছবি এবং সমকালীন রচনা (যেমন নজরুলের কবিতা ও প্রবন্ধ) পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ক উৎস হিসেবে কমিউনিস্ট নেতাদের স্মৃতিকথা, ইতিহাসগ্রন্থ এবং তথ্যনির্দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কালানুক্রমিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপসংহারে পৌঁছানো হয়েছে।

এই প্রবন্ধে 'লাঙল' পত্রিকার ভূমিকার মাধ্যমে প্রচারিত রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম কিভাবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও সাম্যবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং কিভাবে তিনি এই মতাদর্শকে প্রচার ও প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন তা বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত লেবার স্বরাজ পার্টি ও পরবর্তী সময়ে ওয়ার্কস এন্ড পিজেন্টস পার্টি গঠনের প্রেক্ষাটও এখানে আলোচিত হয়েছে।

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্ব নিয়ে গবেষণা করতে গেলে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা একেবারেই উপেক্ষনীয় নয়। তাঁর সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি সাংবাদিকতা এবং রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও বাংলার বামপন্থী রাজনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এই আলোচনার মাধ্যমে সেই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের একটি পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

মূল আলোচনা

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ায় সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ার বিপ্লব সমগ্র দুনিয়াকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে। বিপ্লবের তরঙ্গ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশও নিজেকে বিচ্ছিন্ন চরিত্রে বেঁধে রাখতে পারেনি। বিপ্লবোত্তরকালে মার্কস-লেনিনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা সারা দুনিয়ার মানুষের সাথে সাথে কিছু ভারতীয়দের মনেও দৃঢ়ভাবে রেখাপাত করে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত নেতৃত্ব বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের আহ্বান জানালে, সেই ডাকে সাড়া দিয়ে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নদের অনেকেই রাশিয়ায় গিয়ে উপস্থিত হন।[১] কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবীও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যের বেড়াজাল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে রুশ সরকারের সমর্থন লাভের আশায় রাশিয়ার উপকণ্ঠে উপস্থিত হন।[২] বিপ্লবী নেতাদের অনেকেই ছিলেন মনেপ্রাণে মার্কসবাদী আবার গণতন্ত্রমনা। তবে এ কথা ঠিক যে, নানান অবস্থান ও পাঠের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এম এন রায় তাঁর মেক্সিকান স্ত্রীসহ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে মস্কো আসেন।[৩] কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় সম্মেলন শেষ হলে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর রাশিয়ার তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'।[৪] পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্নে উপস্থিত ছিলেন – এম এন রায়, এভেলিন রায়, অবনী মুখার্জী, রোজা

ইটিংগফ, তিরুমল আচার্য, মহম্মদ শফিক ও মহম্মদ আলি। পার্টির কার্যকরী কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মহম্মদ শফিক।[৫] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে তৃতীয় কংগ্রেসে তাসখন্দে গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির হেডকোয়ার্টার মস্কোতে স্থানান্তরিত করা হয়, পরে আবার ১৯২২ –এ মস্কো থেকে বার্লিনে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বার্লিন শহর থেকেই মানবেন্দ্রনাথ রায় কমিউনিস্ট বইপত্র, পত্রিকা এবং বিবৃতির সাহায্যে প্রগতিশীল নেতা ও কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা শুরু করেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় এসময়ে ভারতের মাটিতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এ লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।[৬] অন্যদিকে, তৃতীয় আন্তর্জাতিক তথা কমিন্টার্ন অনুষ্ঠিত হলে, বাংলায় মুজফ্ফর আহ্মদ, পেশোয়ায় অধ্যাপক গোলাম হুসাইন, লাহোরে শামসুদ্দিন হাসান, বোম্বের শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে প্রমুখ প্রগতিশীল নেতারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে যত্নবান হন। এ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমরা ভারতবর্ষ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব। এটা ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগের কথা। বলা বাহুল্য, আমরা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল এর দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিলাম।[৭] বাস্তবতার নিরিখে সেদিন যারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মুজফ্ফর আহ্মদ, শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, মলয় পুরন, সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার, শওকত ওসমানী, এস ভি ঘাটে প্রমুখরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আরো অনেকে বিক্ষিপ্তভাবে নিজস্ব উদ্যোগে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে তুলেছিলেন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী। কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে ব্রিটিশ সরকার সুনজরে দেখেনি। কমিউনিস্টরা যাতে রুশ বিপ্লবের অনুরূপ কোন পরিবেশ ভারতে সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য তাদের অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও। বেআইনি গ্রেফতার, আটক নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়। বিশেষ নজরদারির উদ্দেশ্যে গোয়েন্দা বিভাগে তৈরি করা হয় ইন্টালিজেস ও স্পেশাল শাখা। ধীরে ধীরে কারাবরণ করেন মুজফ্ফর আহ্মদ, শওকত ওসমানী, গোলাম হোসেনসহ আরও অনেকে। এ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ বলেন, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে শওকত ওসমানী কানপুরে গ্রেফতার হলো, এবং আমি গ্রেফতার হলাম কলকাতায়, তার কয়েকদিন পরেই আবার গোলাম হোসেন লাহোরে গ্রেফতার হয়। আমাদের তিনজনকে ব্রিটিশ-ভারতের রেগুলেশন আইন অনুসারে আটক করে রাখা হয়।[৮] ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর কংগ্রেসের একাংশ মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কলকাতাসহ বোম্বে, মাদ্রাজে কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। উদীয়মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে বিনষ্ট করার জন্য পুলিশের ব্রাঞ্চগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। কমিউনিস্ট কর্মীদেরকে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করে। যদিও ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে মুজফ্ফর আহ্মদ শারীরিক অসুস্থতার কারণে জেল থেকে নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেছিলেন। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। বোম্বে, মাদ্রাজ, বাংলা ও পাঞ্জাবের গোষ্ঠীগুলি একে অন্যের সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। এছাড়া কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদ সাধারণ জনগণ ও মার্কসীয় মতবাদে বিশ্বাসীদের এক স্থানে জমায়েত হওয়ার সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করেছিল। এই পরিস্থিতিতেই ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর ভারতের কানপুর শহরে কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সংগঠিত করে এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।[৯] পার্টির অভ্যন্তরে গঠনতন্ত্র এবং কমিটির বিষয়ে নানান গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, এবং যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন এস ভি ঘাটে।[১০]

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে নজরুল কলকাতায় এলে বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে বঙ্গীয় 'মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে।[১১] ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মার্চ মাসে ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্ট সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় কাজী নজরুল ইসলাম সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে এসে মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করতে শুরু করেন ৩২ নম্বর কলেজ 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে। প্রতিনিয়ত মুজফ্ফর আহ্মদের সাথে নজরুলের সখ্যতা ও অন্তরঙ্গতার গভীরতা বৃদ্ধি পেলে উভয়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য প্রীতি সম্পর্ক তৈরি হয়। নজরুলও ক্রমশ মুজফ্ফরের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন।[১২] যদিও সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীনই নজরুল দেশপ্রেম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বলশেভিক মতাদর্শ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় মুজফ্ফর আহ্মদের উদ্যোগে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার তোড়জোড় শুরু হলে নজরুল সহজে মুজফ্ফর আহ্মদের সহযোগীতে পরিণত হয়েছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই কমিউনিস্ট মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টি করে তোলার কাজে তিনি আত্মমগ্ন হয়েছিলেন। সখ্যতা, অন্তরঙ্গতা ও সর্বোপরি আদর্শিক চিন্তার উপর ভর করে কাজী নজরুল ইসলাম কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের এই প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যদিও তিনি কখনোই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন রেজ্জাক খাঁ এবং আব্দুল হালিম প্রমুখরা।[১৩]

তবে, ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের আগেই মানবেন্দ্রনাথ রায় তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পরপরই ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছিলেন এবং ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর তাঁর সহযোগী নলিনী গুপ্তকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। নলিনী গুপ্ত কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী অনুশীলন ও যুগান্তর দলের পাশাপাশি সাক্ষাৎ করেছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে। নলিনী গুপ্তের সঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদের এই সাক্ষাৎ একদিকে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজকর্মে গতিদান করে অন্যদিকে মুজফ্ফরের সাথে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যোগসূত্র তৈরি হয়। মুজফ্ফরও ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন। এতে সন্দেহ নেই, এই সমস্ত কিছুর প্রভাব নজরুলের ওপরেও অনিবার্যভাবে পড়েছিল।

ইতিমধ্যেই, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে নজরুলের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে মুজফ্ফর আহ্মদ স্বয়ং বলেছিলেন, সাংবাদিকতা জীবন শুরু করার মাধ্যমেই নজরুলের সক্রিয় রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ হতে খবরের কাগজ চালানোর ভেতর দিয়ে নজরুল ইসলাম আর আমি রাজনীতি করেছি।[১৪] নজরুলের সাংবাদিকতার যাত্রা শুরু হয় - ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই জুলাই প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা 'নবযুগ' এর হাতধরে। পত্রিকাটি মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন। তবে, কাগজটির মালিক ছিলেন এ কে ফজলুল হক। নবযুগ পত্রিকায় কৃষক ও শ্রমিকের কথার পাশাপাশি সাধারণ জনগণের নানান সমস্যাবলী তুলে ধরা হত।[১৫] নজরুলের তীক্ষ্ণ রচনায় কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সহমর্মিতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তৎকালীন সময়ের শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পত্রিকায় 'ধর্মঘট' শিরোনামে নজরুলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যেখানে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দেই মেহনতী জনগণের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ যে কতখানি প্রবল ছিল তা বোঝা যায়। নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত নানান রচনা

থেকে এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয় যে, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে শেষভাগ থেকেই নজরুল রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই রাজনীতি ছিল শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি, বলা বাহুল্যও সাম্যবাদী মতাদর্শকে বাস্তবে রূপদান প্রয়াসের রাজনীতি।[১৬]

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে কাজী নজরুল ইসলামেরে সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে 'ধূমকেতু'। অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকাটির নামকরণ নজরুল নিজেই করেছিলেন। ধূমকেতু পত্রিকা সম্পাদনা এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তিনি নিজস্ব সুতীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সত্তা ও দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি এবং সামাজিক বৈষম্য সমূহের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সদাজাগ্রত করার কাজে এই পত্রিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ধূমকেতু একদিকে যেমন বাংলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সমর্থন পেয়েছিল, অপরদিকে তেমনি সাম্যবাদী মতাদর্শ ও চিন্তা ধারার মানুষদেরও সমর্থন পেয়েছিল। ধূমকেতু পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে নজরুলের বিপ্লবী সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। ধূমকেতু ছাত্র-যুব সমাজকে বিপ্লবের পথে আহ্বান জানিয়েছিল। ধূমকেতুতে প্রকাশিত লেখাগুলি থেকে পরিষ্কার হয় নজরুল সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। অহিংসার পথে ভারতের স্বাধীনতা আসতে পারে - এমনবিশ্বাস তাঁর আর ছিল না। নজরুল বিশ্বাস করতেন আপামর জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত বিপ্লব কখনো সাফল্য অর্জন করতে পারেনা। যদি অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান ও যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায়, যদি ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্যকে দূরীকরণ করা না যায়, তবে অচিরেই স্বাধীনতা অবশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়বে। ধূমকেতুর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ এনেছিলেন নজরুল। তিনি মুসলিম সমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে ধূমকেতুকে ব্যবহার করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, ধূমকেতু পত্রিকাতেই ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর সংখ্যায় 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল সরাসরি সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। ধূমকেতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকার সুনজরে গ্রহণ করেনি। যেকোনো প্রকারে পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা আনতে তৎপর হয়েছিল। বিষয়টির চূড়ান্ত পরিণতি নেমে আসে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর ধূমকেতুর সংখ্যায় যখন 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি আগুন ঝরানো কবিতা নজরুল প্রকাশ করেছিলেন। কবিতার পরতে পরতে ছিল তৎকালীন পরিস্থির নগ্নচিত্র। একই সংখ্যায় 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামক একটি ছোট অথচ তীক্ষ্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য নজরুলকে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে, ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় কাজী নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। নজরুল গ্রেফতার হলে পত্রিকার কাজকর্ম ব্যাহত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিচারপর্ব চলাকালীন আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে একটি রচনা ধূমকেতুর ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে ২৭শে জানুয়ারির সংখ্যায় প্রকাশ করেছিলেন। এটিই ছিল ধূমকেতুর শেষ সংখ্যা। ধূমকেতু কোনো কমিউনিস্ট পত্রিকা ছিল না, তবে প্রতিবাদী চরিত্রে মুখর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের সমর্থনে, কৃষক-শ্রমিকের মুক্তির পক্ষে ধূমকেতু ছিল অনন্যতার দাবীদার।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নজরুল রাজনীতিতে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর গতিবিধি কেবল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সভা সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না, বরং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও সাংবাদিকতা সাহিত্যের বাইরে এসে আরো বৃহত্তর রূপ ধারণ করেছিল। এই সময় তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেছিলেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। এই

সক্রিয় রাজনীতি করার সুবাদেই কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারে সাধারণ মঞ্চ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন লেবার স্বরাজ পার্টিতে।[১৭] কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্মদ কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেলে থাকায় তাঁর অবর্তমানে বন্ধু কুতুবউদ্দিন আহ্মদ, হেমন্ত কুমার সরকার, সামসুদ্দিন হুসাইন ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর অবিভক্ত বাংলায় 'লেবার স্বরাজ পার্টি অফ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠন করেন।[১৮] প্রতিষ্ঠার সাথে সংযুক্ত সকলেই এই দলকে জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল বাংলার শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর মুজফ্ফর আহ্মদ জেল থেকে ছাড়া পেলে কলকাতায় ফিরে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারি এই দলে যোগদান করেন। তাঁর সাথে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখরাও যোগদান করেছিলেন। মুজফ্ফর আহ্মদ এই সংগঠনে যোগ দেওয়ার সাথে সাথে তিনি 'লেবার স্বরাজ' পার্টির কাঠামোগত পরিবর্তন করে, সংগঠনকে বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেন। তখন পার্টির নাম হয় 'ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টি'। পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। এই ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টি পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার পথকে অনেকটাই প্রশস্ত ও সুগম করেছিল।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পূর্বের 'লেবার স্বরাজ পার্টি' এবং পরবর্তীকালে 'ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টস পার্টি'র মুখপত্র ছিল 'লাঙল' নামের একটি পত্রিকা।[২০] এই পত্রিকার পরিচালনা ও সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের ওপর। কাজী নজরুল ইসলাম 'লাঙল' পত্রিকায় কমিউনিস্ট চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও আন্দোলনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট খবরাখবর প্রচার করতে থাকেন। বলাবাহুল্য, এই লাঙল পত্রিকায় ছিল অবিভক্ত বাংলায় প্রথম কমিউনিস্ট পত্রিকা। পরবর্তীকালে মুজফ্ফর আহ্মদ কলকাতা ফিরে এসে পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'লেবার স্বরাজ পার্টি' কোনো কমিউনিস্ট সংগঠন ছিল না এবং কাজী নজরুল ইসলামও সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি আকর্ষিত হলেও কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর নজরুলকে কমিউনিস্ট এবং 'লেবার স্বরাজ পার্টি'-কে কমিউনিস্ট সংগঠন বলেই মনে করত।[২১] ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ১লা নভেম্বর 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র সংবিধান অর্থাৎ নীতি ও কর্মসূচি সর্বস্ব একটি ইস্তেহার প্রকাশ হয়েছিল, ইস্তেহারটির স্বাক্ষরকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম অর্থাৎ 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র তরফে নজরুলের নামেই পার্টির ইস্তেহারটি প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হলো 'লাঙল'। এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা।[২২] পরবর্তীকালে এই দলের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'পেজেন্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি অফ বেঙ্গল' হওয়ায় 'লাঙল' সেই দলের মুখপত্রে পরিণত হয়। লেবার স্বরাজ পার্টির অফিস কলকাতার ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোড থেকেই লাঙল প্রকাশিত হত। প্রধান পরিচালক হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম ছাপা হত এবং সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপা হত নজরুলের সৈনিক জীবনের বন্ধু মনিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে মনিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকলেও সম্পাদনার কাজটি প্রকৃতপক্ষে করতেন কাজী নজরুল ইসলাম। পরে মনিভূষণ মুখোপাধ্যায় লাঙলের সাথে যুক্ত না থাকতে চাওয়ায় গঙ্গাধর বিশ্বাসকে সম্পাদক করা হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুলই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক। ধূমকেতুর মতো লাঙলও ছিল আদতেই নজরুলের কাগজ।

নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'লাঙল' পত্রিকার লোগো ছিল বেশ প্রতীকী ও শক্তিশালী। এখানে একজন কৃষক লাঙল কাঁধে প্রতীয়মান - যা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও উৎপাদনশীলতার প্রতীক। লাঙল-এর প্রচ্ছদচিত্রে দেখা যায়, একটি গোলাকার বৃত্তের মাঝখানে বলিষ্ঠ গোঁফ-দাড়িওয়ালা ক'জন উদভ্রান্ত কৃষকের ছবি, যার দৃষ্টি নিবদ্ধ উর্ধ আকাশের দিকে। কৃষকের ডান কাঁধে রাখা লাঙল। লাঙল -এর হাতলের অংশটি শক্ত করে ডান হাত দিয়ে ধরা। মনে হয় যেন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। বাতাসে চারদিকে গাছপালা নুয়ে পড়ছে। কৃষকের কোমরে

দৃঢ়ভাবে গামছা বাঁধা, আদুল গা। আকাশে কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিদ্যুৎরশ্মি। কালো সুতোয় বাঁধা কৃষকের গলার তাবিজ বাতাসের ঝাপটায় বুকের ওপর থেকে উড়ে কাঁধ পর্যন্ত উঠেছে। ভিতরের পাতায় থাকত লাঙল দিয়ে কর্ষণরত কৃষকের ছবি। লাঙলের চিত্রের মাধ্যমে নজরুল সামাজিক বৈষম্য, জমিদারি প্রথা ও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেষ সংখ্যায় লাঙলের পরিবর্তে কাস্তে ও হাতুড়ির প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল, যা মূলত কৃষক-শ্রমিকের নিশান। পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, সর্বোপরি জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলা।

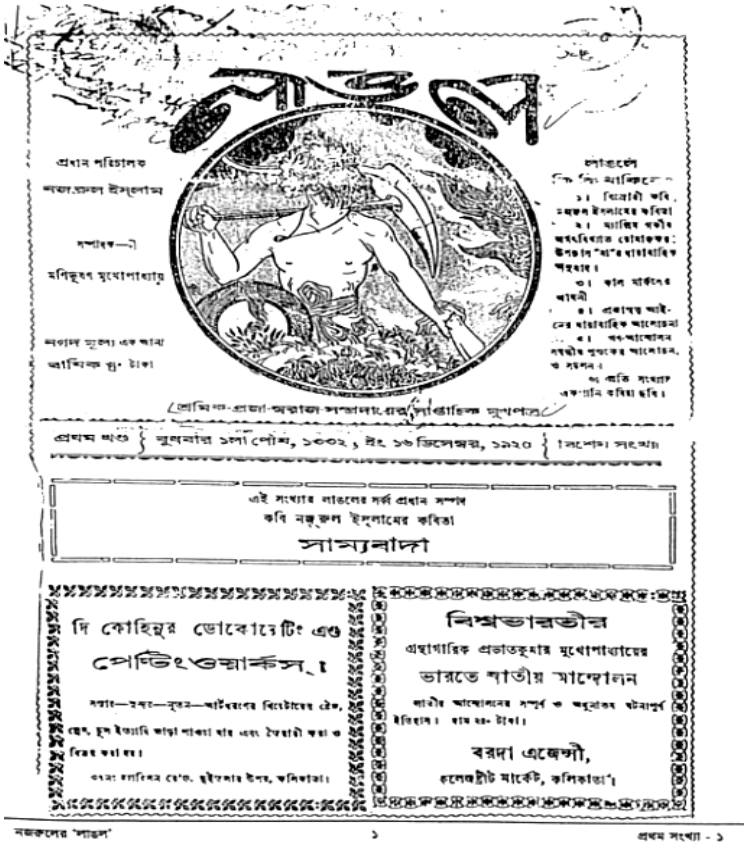

লাঙল

প্রধান পরিচালক

সম্পাদক—

মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এই সংখ্যার লাঙলের সর্ব প্রধান সম্পদ
কবি নজরুল ইসলামের কবিতা
সাম্যবাদী

দি কোহিনুর ডেকোরেটিং এণ্ড পেন্টিংওয়ার্কস্।

বিশ্বভারতীর
গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
ভারতে জাতীয় আন্দোলন

বরদা এজেন্সী,
কলেজষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নজরুলের 'লাঙল' ১ প্রথম সংখ্যা - ১

চিত্র ১: লাঙল পত্রিকার প্রথম সংখ্যা

লাঙলের প্রথম সংখ্যাটিকে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। প্রধান পরিচালক, সম্পাদকদের নাম ছাড়াও ছিল পত্রিকায় কি কি থাকবে তার ঘোষণা। এখানে বলা হয়েছিল-

- বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা।
- ম্যাক্সিম গোর্কির জগৎ বিখ্যাত রোমাঞ্চকর উপন্যাস 'মা'র ধারাবাহিক অনুবাদ।
- কার্ল মার্কসের জীবনী।
- প্রজাস্বত্ব আইনের ধারাবাহিক আলোচনা।

- গণ-আন্দোলন সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা ও সঙ্কলন।
- প্রতি সংখ্যায় একখানি করিয়া ছবি।[২৩]

'লাঙল' পত্রিকা সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়কলমে বলা হয়েছিল-

> যেখানে দিনদুপুরে ফেরিওয়ালী মাথায় করে মাটি বিক্রি করে, সেই আজব শহর কলিকাতায় লাঙল চালাবার দুঃসাহস যারা করে, তাদের সকলেই নিশ্চিত পাগল মনে করেছেন। কিন্তু এই পাষাণ শহরেই আমরা লাঙল নিয়ে বেরুলাম। এই পাশানের বুক চিরে আমরা সোনা ফলাতে চাই। ব্রহ্মপুত্র স্রোত হিমালয় আটকে গেলে হলধর লাঙলের আঘাতে পাহাড় চিরে সেই স্রোতকে ধরায় নামিয়েছিলেন। সেই জল কত প্রান্তর শ্যামল করে কত তৃষিত কণ্ঠের পিপাসা মিটিয়ে বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। 'লাঙলবদ্ধ' আজ বাংলার তীর্থ। মহাত্মাগণের আন্দোলন : আজ নেতাদের পাষাণ পারিপার্শ্বিককে আটকে গেছে - তাই আজ আবার হলধরের ডাক পড়েছে।[২৪]

প্রথম সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ ছিল পঞ্চম পৃষ্ঠা থেকে দশম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নজরুলের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো। প্রথম পৃষ্ঠার মাঝখানে বড় করে বিজ্ঞাপিত ছিল - 'এই সংখ্যার লাঙলের সর্ব্ব প্রধান সম্পদ কবি নজরুল ইসলামের কবিতা সাম্যবাদী'।[২৫] নজরুল ইসলামের "সাম্যবাদী" কবিতাগুচ্ছ এক বিস্ফোরক দ্রোহ, যেখানে তিনি মানুষের সাম্য, ন্যায়বিচার ও শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

> গাহি সাম্যের গান -
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
> গাহি সাম্যের গান![২৬]

এই কবিতাগুলোতে তিনি উচ্চারণ করেছেন এক নির্ভীক প্রতিবাদ, যেখানে ধনী-গরিব, উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ গুঁড়িয়ে দিয়ে এক নতুন পৃথিবীর আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, মানুষই শ্রেষ্ঠ, তার পরিচয় কেবল মানুষ হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ধর্ম, জাত, বর্ণ, লিঙ্গ - কোনো কিছুই মানুষের প্রকৃত পরিচয় হতে পারে না।

> গাহি সাম্যের গান -
> মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
> নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
> সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি -[২৭]

এই অমোঘ ঘোষণা নজরুলের সাম্যবাদী চেতনার শাশ্বত দলিল। এই কবিতাগুলোতে তিনি সরাসরি অত্যাচারী শাসক, জমিদার, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দুঃখী, বঞ্চিত, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার। তিনি মনে করতেন, ক্ষমতাসীন শ্রেণি মানুষকে শোষণ করে, ধর্মকে ব্যবহার করে তাদের বিভক্ত করে রাখে। তাই তাঁর কবিতায় এই শোষণের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। নজরুল শুধু আর্থসামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধেই দাঁড়াননি, তিনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কাব্যে বারবার উঠে এসেছে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃত ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে না, বরং একত্রিত করে। নারীকে তিনি দেখেছেন পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে। তিনি বলেছেন-

> বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।[২৮]

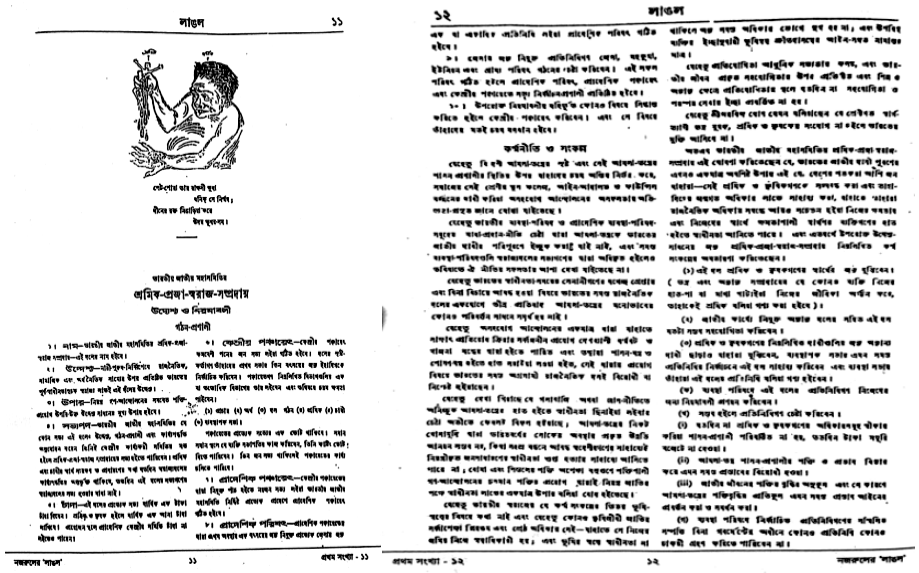

এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাম্যবাদী চেতনাকে আরও প্রসারিত করেছে। সাম্যবাদী নিছক কবিতা নয়, এটি এক সংগ্রামের ডাক, এক মহামন্ত্র, যা মানুষকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শেখায়। কবিতার জনপ্রিয়তার কারণে পত্রিকার ৫ হাজার কপি দ্রুত শেষ হয়ে যায়।

প্রথম সংখ্যার একাদশ থেকে এয়োদশ পৃষ্ঠায় 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে এটাই ছিল পার্টির সংবিধান।

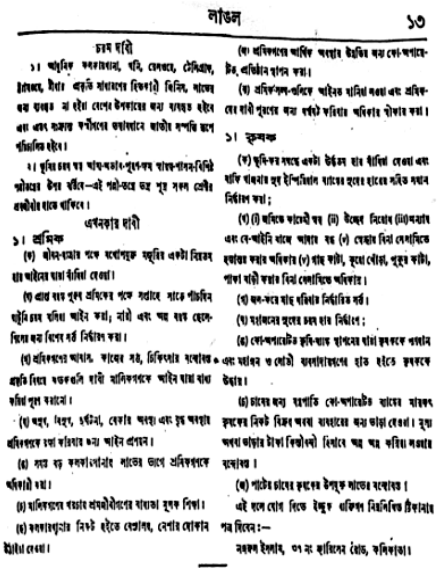

চিত্র ২: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়'

নজরুলের লেবার স্বরাজ পার্টির সংবিধানের মূল বিষয়বস্তু - শ্রমিক ও কৃষকদের ন্যায্য অধিকার, জমির মালিকানায় কৃষকদের অগ্রাধিকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ও ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে তীব্র করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

লাঙলের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯শে ডিসেম্বর।[২৯] পত্রিকার একাদশ পৃষ্ঠায় 'খড়কুটো' শিরোনামে প্রথম সংখ্যার জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বলা হয় -

> গতবার আমরা ৫ হাজার 'লাঙল' ছেপেছিলাম - কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত কাগজ ফুরিয়ে যাওয়াতে কলিকাতায় অনেকে কাগজ পাননি এবং মফস্বলে একেবারেই কাগজ পাঠানো হয়নি। ঐ সংখ্যার প্রধান সম্পদ কবি নজরুলের 'সাম্যবাদী' গ্রাহকগণের আগ্রাতিশয্যে পুস্তিকারে বের করা হলো দাম করা হয়েছে মাত্র দু'আনা।[৩০]

তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'মাটীর মোহ' প্রবন্ধটি রচনা করেন শ্রী গিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি সচেতন ভাবে ভারতীয় সমাজে বিদ্যমান অচলায়তনকে চিহ্নিত করেছেন, আবার তা ভেঙে ব্রাত্যজনের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে তাগিদ তা প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি লিখলেন -

> মাটীর বন্ধনই তার সমাজের বেষ্টনী হয়েছে। মাটীর প্রেমেই তার রাজনীতির ভিত্তি, তার জাতি-বোধের পটভূমি অঙ্কিত হয়েছে। Geographical limit, natural boundary এগুলোই অনেকগুলো মানুষকে একত্র হবার প্রেরণা দেয় নাই। তার পায়ের তলায় যে প্রেমের পরশ, হাস্যোজ্জ্বল প্রেয়সীর যে আলিঙ্গন - তাই তাকে ধরণীর সমস্ত সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়েছে। মাটীর কণ্ঠে যে ঐক্যের আহ্বান, মিলনের গীতি, তারই মাঝে জাতির বেদ, জাতীয়তার নান্দীপাঠ লুকিয়ে ছিল। আদিম মানুষ political advantage -এর জন্য জাতি-গঠন করে নাই। তার পায়ের নীচে যে নির্ব্বাক জগৎ, শুধু একত্র হবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উন্মুখ হয়েছিল, জাতি-গ্রষ্টাদের কাছে তা স্পষ্ট হয়েছিল। মাটীর নিশ্চলতার মধ্যে ঐক্যের বাণী তাঁরা শুনেছিলেন। আমরা তাই আজ এই অভ্যস্ত সভ্যতার যুগেও সেই tradition মেনেই চলছি। আমাদের আগে যারা গেছেন তাঁরাও শুধু এই রকম একটা ভাবের দ্বারা চালিত হয়েই মানুষের ইতিহাস রচনা করে গেছেন।[৩১]

সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নজরুল ইসলামের 'কৃষাণের গান' কবিতাটি। নজরুল ইসলামের 'কৃষাণের গান' কবিতাটি কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা, শ্রমের গৌরব ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে রচিত। কবি এখানে কৃষকদের কঠোর পরিশ্রমের কথা বলেছেন, যাঁরা মাটি চষে, ফসল ফলিয়ে সমাজকে খাদ্য জোগান, অথচ নিজেরাই ক্ষুধার্ত থাকেন। জমিদার ও মহাজনদের শোষণে তাঁরা সর্বস্বান্ত হয়ে, জীবনের মূল আনন্দ থেকেও বঞ্চিত থাকেন।

> সত্য ক্রেতা দ্বাপর জুড়ে ছিল না ভাই ক্লেশ,
> দস্যু-যুগের লুটতরাজে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
> লক্ষ্য হাতে টানছে তারা লক্ষী মায়ের কেশ
> মার কাঁদনে লোনা হলো সাত সাগরের জল।[৩২]

কবিতায় নজরুল কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের শ্রমের মর্যাদা তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি, তিনি কৃষকদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, যেন তারা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় এবং শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা এখানে স্পষ্ট, কারণ তিনি কৃষকদের শুধু ভাগ্যের হাতে ছেড়ে না দিয়ে সংগ্রামে নামার আহ্বান জানিয়েছেন।

> জাগ্ রে কৃষাণ সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়
> ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়
> বল সবে ভাই, বল কৃষাণেরর বল লাঙ্গলের জয়,
> দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল।[৩৩]

প্রকৃতির সঙ্গে কৃষকের গভীর সম্পর্কও কবিতায় উঠে এসেছে। কৃষকরা যেমন জমিকে ভালোবেসে ফসল ফলায়, তেমনই প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতার সঙ্গেও তাদের লড়াই করতে হয়। নজরুলের কলমে কৃষকের এই জীবনসংগ্রাম শুধু করুণ রূপে ধরা দেয়নি, বরং শক্তি ও সাহসের বার্তাও দিয়েছে। কৃষকের ঘামেই সভ্যতার অগ্রগতি, তাই তাঁদের প্রতি সমাজের ঋত স্বীকার করা উচিত- এমন এক অন্তর্নিহিত সত্য এই কবিতায় কবি প্রকাশ করেছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় কার্ল মার্কসের জীবনী ছিল দ্বিতীয় সংখ্যায় চমক। জীবনীটি লিখেছিলেন শ্রীদেবব্রত বসু। বাংলা ভাষায় মার্কসের জীবনী তুলে ধরা নিঃসন্দেহে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনাপর্বে আপামর পাঠকের কাছে এক আবেদন। এই সংখ্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' উপন্যাস। এটির ধারাবাহিকভাবে অনুবাদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ধারণা করা যায়, তার মাধ্যমেই সর্বপ্রথম 'লাঙল' পত্রিকা মারফত বাংলা ভাষায় প্রথমবারের মতো অনুদিত হয়েছিল 'মা' উপন্যাস। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে চতুর্থ, পঞ্চম বাদ দিয়ে ষষ্ঠ ও সপ্তম, অষ্টম থেকে দশম সংখ্যায় বাদ দিয়ে একাদশ থেকে ধারাবাহিকভাবে চতুর্দশ সংখ্যায় - ভেঙে ভেঙে মোট ৯ কিস্তি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেবারের মতো অনুবাদটি অসম্পূর্ণই রয়ে যায়। উপন্যাসটি রাশিয়ার ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত, যেখানে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্থান তুলে ধরা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র একটি গল্প নয়, বরং বিপ্লবের জন্য একটি আদর্শগত অনুপ্রেরণা। শ্রমিক শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা, তাদের উপর শোষণের বাস্তব চিত্র এবং সর্বোপরি তাদের সংগ্রামের চিত্রের প্রতিফলন 'মা'। উপন্যাসটি প্রকাশের মাধ্যমে নজরুল কার্ল মার্ক্সের শ্রেণিসংগ্রাম তত্ত্বকে সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শকে ছড়িয়ে দিতে উপন্যাসটিকে ব্যবহার করেছেন। লাঙলে 'মা' উপন্যাস যেন বিপ্লবী মানসিকতার প্রতি আহ্বান।

পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৭ই জানুয়ারী ১৯২৬।[৩৪] প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় করে লেখা ছিল নজরুলের 'সব্যসাচী'। নজরুলের 'সব্যসাচী' কবিতাটি এক অকুতোভয়, সর্বগুণসম্পন্ন মানুষের প্রতিচিত্র। কবিতায় কবি এমন এক ব্যক্তিত্বের রূপ আঁকেন, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান, ভয়কে জয় করেন এবং সাম্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে সদা প্রস্তুত থাকেন। নজরুল এখানে ব্যক্তির ক্ষমতা, তার সাহস, তার আত্মপ্রত্যয় এবং সংগ্রামের চেতনা তুলে ধরেছেন। কবিতার প্রতিটি চরণ যেন এক একজন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যা পাঠকের হৃদয়ে উদ্দীপনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। "সব্যসাচী" শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি নয়, এটি এক আদর্শ, এক দর্শন, যা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শেখায়, অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার শিক্ষা দেয়। কবিতার প্রতিটি শব্দে নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার প্রকাশ স্পষ্ট। তিনি যে সাম্য, মুক্তি, শক্তি এবং মানবতার পক্ষে ছিলেন, তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই কবিতা। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনায় নজরুল গান্ধীজীর অধ্যাত্মবাদী আদর্শেরও অনুগামী ছিলেন না। এমনকি গান্ধীজীর 'অহিংসা পরম ধর্ম' কিংবা তার-ই ধারাবাহিক আন্দোলন-আদর্শের সপক্ষেও তাঁর ধনাত্মক অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না। এ প্রাসঙ্গিক বিষয়টি তাঁর 'সব্যসাচী' কবিতায় সুব্যক্ত। নজরুলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় -

> 'সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুণি!
> জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেলো মিথ্যার তাঁত বুনি!
> দক্ষিণ করে ছিড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি
> এ-নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ শস্ত্রপাণি!...'[৩৫]

তৃতীয় পৃষ্ঠায় শ্রীদেবব্রত বসুর 'লেনিন ও সোভিয়েট রুষিয়া' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। পরবর্তীতে তিন, চার, ছয়, সাত, নয় সংখ্যায় ৬ কিস্তিতে রচনাটি প্রকাশিত হয়। লেনিনসহ অন্যান্য রুশ পণ্ডিতদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রকাশিত লেখাগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। এই বিপ্লবী মানসিক সচেতনতার মূর্ত ছবি পাওয়া যায় পরের পৃষ্ঠায় যখন লেখা হয় -

তোমরা কাটো মাথায় টেরী
মোদের রক্তে নেয়ে উঠে,
তোমরা চড় জুড়িগাড়ি
মোদের সকল লুটেপুটে
আমরা চষি তোমার জমি
আমরা জোগাই তোমার ভাত
আমরাই আজ খালি পেটে
ভাবছি দিয়ে মাথায় হাত।[৩৬]

লাঙলের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৬ই জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই সংখ্যার ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের খবরটি। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের বিষয়টি যেমন তাৎপর্যপূর্ণ তেমনি লাঙ্গলের পাতায় গুরুত্বের সাথে পৃথক একটি বড় কলমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার খবরটি নিঃসন্দেহে বাংলায় কমিউনিস্ট মানসিকতা ও রাজনীতিকে বৃহত্তর আঙ্গিকে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস। রিপোর্ট লেখা হয় -

> যেহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধনীকগণের দ্বারা এবং ভারতীয় জমিদারগণের শোষণ বৃদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষের শ্রমিক ও কৃষকগণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় দলসমূহে বীর্যবাদেরই সামাজিক প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে আর এই প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকগনের উন্নতির পরিপন্থী, সেহেতু ভারতীয় কমিউনিস্টগণের এই সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তির জন্য একটি দল গঠিত হউক। কমিউনিস্ট এই দল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি নামে অভিহিত হইবে। এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণের সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ভূমি, খনি, গৃহ, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ইত্যাদি যে সমস্ত জনসম্পদের উপর জনসাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া উচিত সেই সমস্ত সম্পদকে সর্বাধিকারভুক্ত ও সর্ব নাগরিকদের আয়ত্ত কোরিয়া ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মানুষের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ব্যবস্থা করা কমিউনিস্ট পার্টির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে।[৩৭]

এ সংখ্যায় ছাপা হল মুজফ্ফর আহ্মদের প্রবন্ধ 'ভারত কেন স্বাধীন নয়?' তিনি লিখলেন -

> ভারতবর্ষ একটি অভিশপ্ত দেশ নিরবিচ্ছিন্ন অভিশাপ এর সকল দিককে ঘিরে রেখেছে। এদেশে প্রাচীনকালে বড় বড় ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারা নাকি বলে গিয়েছিলেন জীবনটা নিছক মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাদের মতে জীবনে বিয়োগের অংকটা যতই বাড়ানো যায়, ততই নাকি অন্যের কাজ করা হয়। আর যুগের অংক বাড়ালে হয় পাপ, এমন বড় পাপ যে তার কোন কালে ক্ষমা নেই। পরে এলেন মুসলমানরা। তারাও নিয়ে এলেন গোটা কতক থিওলজি অর্থাৎ ব্যবস্থা শাস্ত্রের কেতাব। .... এই মোল্লারা শেখাচ্ছেন পৃথিবীর সুখ দুঃখ টা কিছুই নয়। কোন রকম করে দুনিয়ার দুদিনের জীবনটা দুঃখ কষ্টে কাটালেই হলো, তারপরে, পরকালে অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত জীবন আর অনন্ত সুখ। মোটের উপর কপোট সাধু - সন্ন্যাসী - গুরু পুরোহিত ও মোল্লা- মৌলবী ফকিরগণ ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হতে সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার বিলোপ সাধন করে দিয়েছেন। এদের ফাঁদে পড়ে ভারতের কৃষাণ ও শ্রমিকগণ বাকির লোভে হাতে পাওয়া জিনিসটা খুইয়ে বসে আছে। ... ভারতের প্রাণশক্তি হচ্ছে ভারতের চাষী আর মজুরগণ।[৩৮]

এদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এদের চাওয়া না চাওয়ার উপর নির্ভর করছে।[৩৯]

লাঙলের পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে। এই সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে ছিল বিশাল আয়োজন। যদিও চতুর্দশ পৃষ্ঠায় 'কমিউনিজম ও বলশেভিজম' শিরোনামে সাম্যবাদী সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ ও অন্যান্য কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে সাম্যবাদ ও ধর্মের সম্পর্কগুলি গুরুত্ব পেয়েছিল।

কানপুর, ২৫ ডিসেম্বর কংগ্রেস মন্ডপের সন্নিকটে নিম্মিত আরেকটি বিশেষ মণ্ডপে সন্ধ্যায় ভারতীয় সাম্যবাদী সম্মিলন এর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে এই সভায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য - মৌলোনা আজাদ শোভানি, শ্রীযুক্ত অজ্জুনলাল শেঠি সত্যভক্ত বেগম মোহানি এবং মৌলভী মুজফ্ফর আহ্মদ। প্রথম দেখার মৌলভী মুজফ্ফর আহ্মদ বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মামলার অন্যতম আসামি ছিলেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

সমবেত ভক্ত বৃন্দকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া মৌলানা হযরত মুহানি সাম্যবাদী সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন - সর্বপ্রকার বৈধ উপায় স্বরাজ অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করায় আমাদের অভিপ্রায়। অতঃপর আমরা দেখিবো যাহাতে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ সোভিয়েত সাধারণ তন্ত্রের আকার ধারণ করেদ।[৪০]

পঞ্চদশ পৃষ্ঠায় মুজফ্ফর আহ্মদের একটি কলম প্রকাশিত হয় 'কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' শিরোনামে। এখানে মুজফ্ফর আহ্মদ সরাসরি পাঠকের উদ্দেশ্যে কিংবা বলা যায় কমিউনিস্ট ভাবধারাতে উদ্বুদ্ধ জনগণের প্রতি কমিউনিস্ট রাজনৈতিক আন্দোলনের ময়দানে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন -

সকলেই জানেন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিস্ট গনের প্রথম সম্মেলন হয়েছিল। স্থির হয়েছে বোম্বেতে কমিউনিস্ট পার্টির একটি কেন্দ্র কার্যালয় আর কানপুর কলিকাতা লাহোর ও মাদ্রাজে পৃথক পৃথক শাখা কার্যালয় স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ হতে প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র রাধামোহন গোকুলজি উপস্থিত ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলাম বটে, কিন্তু, আমি গিয়েছিলুম আলমোরা হতে। কলিকাতায় কার্যালয় স্থাপন করা ও বাংলাদেশে পার্টি গঠন করার ভার আমার উপরে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় যারা কমিউনিস্ট আছেন তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন, এই সন্নিবিদ্ধ অনুরোধ আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি। কমিউনিস্ট হতে বলা এদেশের আইন অনুসারে অপরাধ নয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্টগণ পার্টি গঠন সম্বন্ধে কতদূর কি করিতে রাজি আছেন তা আমায় জানালে আমি বাধিত হব।[৪১]

লাঙলের ষষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৪ই মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যায় নবম পৃষ্ঠায় মুজফ্ফর আহ্মদ 'কোথায় প্রতিকার' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে মূলত সমাজের নানা অসঙ্গতি, এবং রাজনৈতিক বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে কীভাবে দেশের মানুষ ধর্মের নামে নিপীড়িত হচ্ছিল, কীভাবে তাদের সামাজিক অধঃপতন শুরু হয়েছিল তা তিনি দেখিয়েছেন।

আমি জানি ধর্মের স্বাভাবিক ঘৃণা আমাদের দেশের লোকদের এমনি অন্ধকারে রেখে দিয়েছে যে অপর ধর্মাবলম্বীকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে পারে না। এই অন্ধত্ব হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবেই আছে। ..... ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হওয়ার পূর্বক্ষণে আকাশ যেরূপ ভাব ধারণ করে থাকে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ ঠিক সেইরূপ ভাবই ধারণ করে আছে। হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, খিলাফত, তবলিক, তনজিম মুসলিম লীগ প্রভৃতিতে মিলে এমন একটি সর্বনেশে ব্যাপার ঘটিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করে তুলেছে যে তাতে ভারতের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। চারিদিক থেকে এই যে অমঙ্গল ঘনিয়ে এসেছে এর প্রতিকার কোথায়? কি করে ভারত বর্ষ আজ আপনাকে এই সকল অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে পারে?[৪২]

এই সংকট থেকে মুক্তির পথ কী হতে পারে, সেটাও লেখক তাঁর প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, শুধুমাত্র সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করলেই এই শোষণ থেকে মুক্তি সম্ভব নয়, বরং সংগঠিত আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণকে নিজেদের অধিকার আদায় করতে হবে। এই অধিকার আদায়ের পথ হিসাবে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কমিউনিস্ট আন্দোলন তথা রাজনীতিকে চিহ্নিত করেছেন।

> একটিমাত্র জিনিষ-কম্যুনিজম- আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কমিউনিস্টরা মনুষ্যতাকে বড় বলে মানে। সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয় না। তারা ধনীক বর্ণের লোভ লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে সর্ব্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বন্টনের সুব্যবস্থা করে কমিউনিস্টরা জগতে স্থায়ী শান্তি আনায়ন করবে।[৪৩]

দশম ও একাদশ সংখ্যায় কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়কে গুরুত্ব দিয়ে 'ময়মহনসিংহ জেলা কৃষক-শ্রমিক সন্মেলন' ও 'নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সন্মেলনে'র খবর প্রকাশ পায়।

লাঙলের সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২১শে মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। এই সংখ্যায় কুতবুদ্দীন আহ্‌মদের 'কার্ল মার্কসের শিক্ষা' প্রবন্ধটি পাঠকমহলে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কেননা, মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক দর্শনগত বিষয়টিকে এখানে সহজে উপস্থাপন করা হয়। পত্রিকায় এই ভাবে মার্কসবাদ শিক্ষার আয়োজন নিঃসন্দেহে লাঙলের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা যায়।

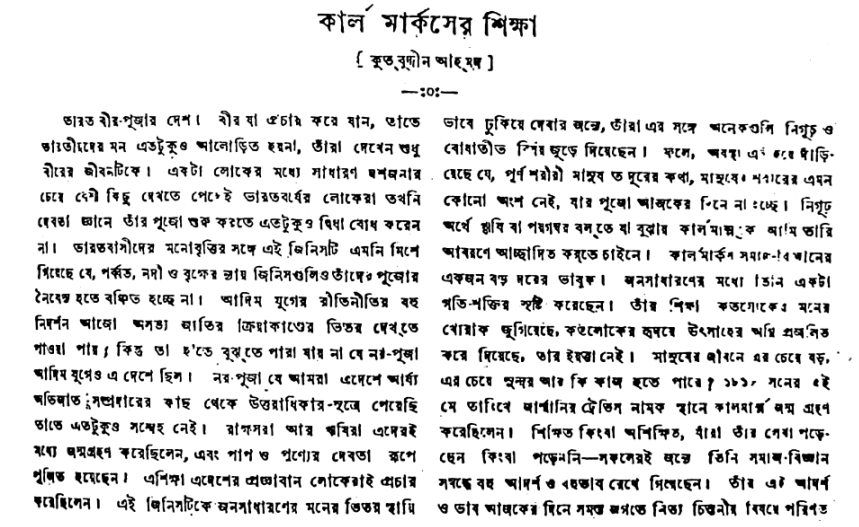

কার্ল মার্কসের শিক্ষা

[কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ]

—:o:—

ভারত বীর-পূজার দেশ। বীর যা প্রচার করে যান, তাতে ভারতীয়দের মন এতটুকুও আলোড়িত হয়না, তাঁরা দেখেন শুধু বীরের জীবনটিকে। একটা লোকের মধ্যে সাধারণ জনজনার চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পেলেই ভারতবর্ষের লোকেরা তখনি দেবতা জ্ঞানে তাঁর পূজো শুরু করতে এতটুকুও দ্বিধা বোধ করেন না। ভারতবাসীদের মনোবৃত্তির সঙ্গে এই জিনিসটি এমনি মিশে গিয়েছে যে, পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষের ন্যায় জিনিসগুলিও তাঁদের পূজোর নৈবেদ্য হতে বঞ্চিত হচ্ছে না। আদিম যুগের রীতিনীতির বহু নিদর্শন আজো অসভ্য জাতির ক্রিয়াকাণ্ডের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু তা হ'তে বুঝ্‌তে পারা যায় না যে নর-পূজা আদিম যুগেও এ দেশে ছিল। নর-পূজা যে আমরা এদেশে আর্য্য অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি তাতে এতটুকুও সন্দেহ নেই। রাক্ষসরা আর ঋষিরা এদেরই মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং পাপ ও পুণ্যের দেবতা রূপে পূজিত হয়েছেন। এশিক্ষা এদেশের প্রজ্ঞাবান লোকেরাই প্রচার করেছিলেন। এই জিনিসটিকে জনসাধারণের মনের ভিতর স্থায়ি ভাবে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে, তাঁরা এর সঙ্গে অনেকগুলি নিগূঢ় ও বোধাতীত শিং জুড়ে দিয়েছেন। ফলে, অবস্থা এই রূপ দাঁড়িয়েছে যে, পূর্ণ শরীরী মানুষ ত দূরের কথা, মানুষের শরীরের এমন কোনো অংশ নেই, যার পূজো আজকের দিনে না হচ্ছে। নিগূঢ় অর্থে ঋষি বা পয়গম্বর বল্‌তে যা বুঝায় কার্ল মার্ক্সকে আমি তারি আবরণে আচ্ছাদিত করতে চাইনে। কার্ল মার্ক্স সমাজ-বিজ্ঞানের একজন বড় দরের ভাবুক। জনসাধারণের মধ্যে তিনি একটা গতি-শক্তির সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শিক্ষা কতলোকের মনের খোরাক জুগিয়েছে, কতলোকের হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্বলিত করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে সুন্দর আর কি কাজ হতে পারে? ১৮১৮ সনের ৫ই মে তারিখে জার্মানির ট্রেভিস নামক স্থানে কার্লমার্ক্স জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত, যাঁরা তাঁর লেখা পড়েছেন কিংবা পড়েননি—সকলেরই জন্যে তিনি সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বহু আদর্শ ও বহুভাব রেখে গিয়েছেন। তাঁর এই আদর্শ ও ভাব আজকের দিনে সমস্ত জগতে নিত্য চিন্তনীয় বিষয়ে পরিণত

চিত্র ৩: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত কুতবুদ্দীন আহ্‌মদের 'কার্ল মার্কসের শিক্ষা'

লাঙলের অষ্টম সংখ্যা **১১ই** ফেব্রুয়ারিতে শ্রীসুকুমার চক্রবর্তীর রচিত 'চীনের নবজন্ম' প্রবন্ধে চিনের নায়ক সান ইয়াৎ সেনের চিন্তাধারা, সংগ্রামের বিষয়টি প্রকাশিত হয়। জন-গণতন্ত্রবাদ, জন- জীবিকাবাদ ও জন-জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত চীনের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক ছিলেন সান ইয়াৎ সেই। চীনা সংস্কারবাদীদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিমূলক সময়ে তিনি যে তীব্র সংগ্রাম করেছিলেন তা সমগ্র বিশ্বের বিপ্লবীদের কাছে শিক্ষণীয়।

চীন-রাষ্ট্র-গুরু ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেন।

চীনের নবজন্ম।

(শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, বি, এস, সি ও শ্রীসুরেশ বিশ্বাস. বি, এ)

গোড়ার কথা

চিত্র ৪: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রী সুকুমার চক্রবর্তীর ‘চীনের নবজন্ম’

৬ই ফাল্গুন প্রকাশিত লাঙলের নবম সংখ্যায় বিশেষ আকর্ষণ ছিল নজরুলের ‘শ্রমিকের গান’। কবিতাটি তাঁর বিপ্লবী চেতনার এক অনন্য উদাহরণ। এই কবিতায় তিনি শ্রমিক শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা, কঠোর পরিশ্রম, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তাঁদের গৌরব ও মর্যাদার কথা তুলে ধরেছেন।

ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নিদি দেখবি দিকে জ্বেলে রে।[৪৪]

নজরুল এই কবিতায় শ্রমিকদের প্রতি সমাজের দ্বিচারিতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। সমাজের ধনী ও ক্ষমতাশালীরা শ্রমিকদের শ্রমকে ব্যবহার করে নিজেদের সম্পদ ও বিত্ত বাড়িয়ে তোলে, অথচ শ্রমিকদের যথাযথ পারিশ্রমিক দেয় না। ধনীক শ্রেণি আরাম-আয়েশে জীবন কাটায়, অথচ শ্রমিকদের ঘাম-রক্তে তৈরি সেই সমৃদ্ধির ফল তাদের হাতে পৌঁছায় না। এই বৈষম্যকে নজরুল চরম অন্যায় বলে মনে করেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

যত শ্রমিক শুষে নিংড়ে প্রজা
রাজা উজির মারছে মজা
আমরা মরি বয়ে তাদের বোঝা রে!
এবার জুজুর দল ওই হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।[৪৫]

নজরুল এই কবিতায় শ্রমিকদের জাগ্রত হতে বলেছেন। তিনি তাদের ভয়ের শৃঙ্খল ভেঙে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নামতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি মনে করেন, শাসকশ্রেণি কখনোই সহজে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দেবে না, তাই সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি সম্ভব নয়। নজরুলের এই আহ্বান মূলত শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, নিজেদের শক্তিকে উপলব্ধি করার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়ে তোলার জন্য।

মোদের যা ছিল সব দিয়েছি ফুকে
এইবারে শেষ কপালঠুকে
পূর্ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
আবার নতুন করে মল্লভূমে
গর্জাবে তাই দল মাদল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল
ঐ শয়তানি চোখ কলের বাতি
নিভিয়ে আয়রে ধ্বংস সাথী
ধর হাতিয়ার, সামনে প্রলয় রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয়
আধার নায়ে চলবি চল।
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।[৪৬]

পত্রিকার নবম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল 'নিখিল-বঙ্গীয় প্রজাসম্মেলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে উত্থাপিত কৃষক-শ্রমিকের বাস্তবিক চাহিদা ও দাবিগুলি প্রকাশ করা হয়।

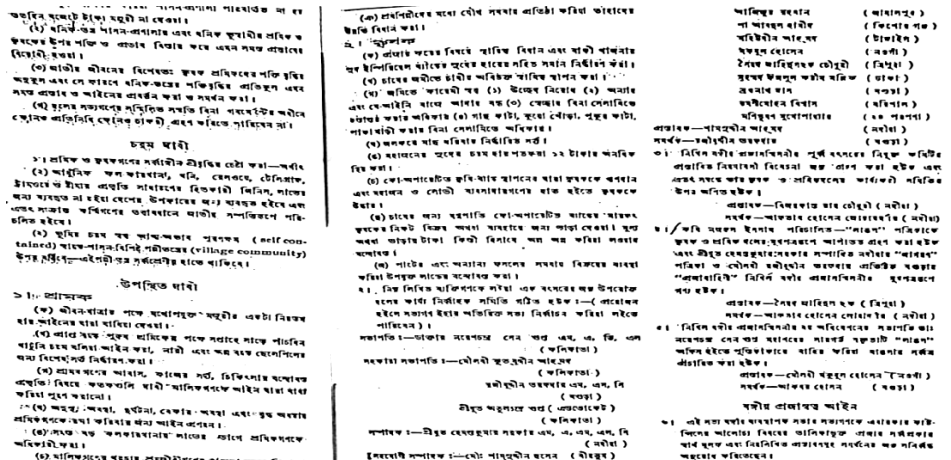

চিত্র ৫: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিখিল-বঙ্গীয় প্রজাসম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে উত্থাপিত কৃষক-শ্রমিকের দাবিসমূহ'

১৩ই ফাল্গুন দশম সংখ্যায় তৃতীয় পাতায় ম্যাক্স বিয়াসের সোশ্যালিজমের উপর ছোট্ট একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এখানে সাম্যবাদের উপর একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। নিঃসন্দেহে পাঠকের মনে সাম্যবাদের প্রসারের ক্ষেত্রে এটি বেশ জোড়ালো প্রভাব ফেলেছিল।

> সকল দিক থেকে দেখলে সোশ্যালিজম বলতে এমন কতকগুলি মত ও অনৈতিক অনুশাসনের সমষ্টিকে বোঝায় যা দ্বারা সমাজের পুনর্গঠনে প্রণালী সমূহ সূচিত ও প্রণোদিত হয়ে থাকে। এই পুনর্গঠনের ভিত্তি, উৎপাদনের বাস্তব উপায়ে সমূহে সর্ব্বসাধারণের অধিকার এবং মানুষ আর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন হওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র বলবে যদি জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সমূহের পরিচালনা বোঝায়, তাহলে সোশ্যালিজম এর ব্যাখ্যায় হবে জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের এই দ্বারা জনসাধারণের উৎপাদনের উপায় সমূহের নিয়ন্ত্রণ।[৪৭]

অষ্টম সংখ্যার পর আবার এই সংখ্যায় 'চীনের নবজন্ম' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। চীনের বিপ্লবের প্রেক্ষাপট, প্রস্তুতি ও অন্যান্য বিষয়গুলি উপস্থাপন করা হয়। একটি রাষ্ট্র কি ভাবে বৈদেশিক উৎপীড়নের শিকার হয়ে ধীরে ধীরে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে তৎপর ছিল তা সন্ধান করা হয়েছিল। চতুর্দশ পৃষ্ঠায় মুজফ্ফর আহ্মদের 'শ্রেণি সংগ্রাম' - এর বিষয়ে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এখানে শ্রেণির ধারণা, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মার্কসীয়ও মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় এই শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম। মুজফ্ফর আহ্মদ এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে পাঠকদের কাছে কমিউনিস্ট ভাবধারা ও দর্শন প্রচার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

শ্রেণি-সংগ্রাম

(মুজফ্ফর আহ্মদ)

শ্রেণি-সংগ্রামের নাম শুনেই অনেকে আঁতকে উঠেন। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, অরাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, মানবতার প্রেমিক ও নিরপেক্ষ বাদী —প্রত্যেকেই এ জিনিসটিকে খারাব ভাবে গ্রহণ করে থাকেন, এবং এর জন্যে তাঁরা দায়ী করেন সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টদিগকে। তাঁদের অভিযোগ এই হচ্ছে যে সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্টরা কেবল মাত্র শ্রমিক ও কৃষকদেরই পক্ষাবলম্বন করছেন, এবং ইহার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা কেবল বেড়েই যাচ্ছে। আর এক দল লোক আছেন যাঁরা কার্লমার্ক্স হতে আরম্ভ করে লেনিন পর্য্যন্ত প্রত্যেককেই সমান ভাবে ভক্তি করে থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশে শ্রেণি-সংগ্রাম জিনিষটিকে প্রশ্রয় দিতে তাঁরা একেবারেই রাজীনন। শ্রেণি-সংগ্রামের দ্বারা ভারতবাসীর মধ্যেই পরস্পর সংঘাত বেধে যাবে, এই আশঙ্কা তাঁরা করেন। ভারতবর্ষ বিদেশীর শাসনাধীনে রয়েছে। যতদিন না এ বিদেশীদের বিদেয় করে দেওয়া যায় ততদিন ঘরের বিরোধ তাঁরা ঘটাতে চান না। দেশীয় জমীদার দেশীয় কৃষকদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেন, আর দেশীয় ধনিকেরা দেশীয় শ্রমিকদের রক্ত শুষে খান, এসব কথা তাঁরা জানেন ও মানেন। তাঁদের মতে এসবই আমাদের সয়ে নিতে হবে যতদিন না ইংরেজরা আমাদের দেশথেকে চলে যায়।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংগ্রাম—স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টদের তারা সৃষ্টি হয়নি। সমাজের অসম গঠনের জন্য এ যুদ্ধ আপনা হতেই বেধে বসে আছে। সোশ্যালিষ্ট বা কম্যুনিষ্টদের একটি প্রাণীও যদি আজকের দিনে বেঁচে না থাকে তবুও শ্রেণীর সংগ্রাম সমাজ হতে কিছুতেই মিটবে না।

সমাজে শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে বলেই শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছে। আমরা জমিদার, মহাজন, ধনিক, ব্যবসায়ী, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের কথা বলে থাকি। এমন কোন মূর্খ আছে যে সমাজের সকল লোককে এসব নামে ডাকতে পারে? আমরা

চিত্র ৬: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত মুজফ্ফর আহ্মদের 'শ্রেণি সংগ্রাম'।

লাঙলের একাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২০শে ফাল্গুনে। এই সংখ্যার সাত নম্বর পৃষ্ঠায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিশ্লেষণমূলক রচনা। এটি মূলত ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, বিভেদ এবং তার পেছনের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে। ধর্ম দিয়ে ভারতীয় নেতৃত্বের সমস্যার সম্পর্কে বলেন -

> অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের দেশের যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেই হিন্দু মুসলমানের যথার্থ মিলনের সমস্যার সমাধান করিতে গিয়ে খিলাফত নামক একটি অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া দিয়েছেন, যে পদার্থটির যথার্থ স্বরূপ অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রতিয়মান না হইলেও আজ খুবই স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।[৪৮]

রাষ্ট্র যে তার নিজের স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তাই সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির সম্মুখীন হয়েও তিনি লিখেছিলেন "ভারতবর্ষের হিন্দুর রক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানের ধমনীর শিরায় শিরায় প্রবাহিত। অথচ কেন তবে এ সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন ক্রমেই শেষ হইতেছে না?"[৪৯] বাস্তবিক সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধান করেছেন মানুষের ব্যক্তিগত মানসিকতার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আর এই ভার ন্যাস্ত করেছেন রাষ্ট্রের উপর।

> রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মমতের যে কোন স্থান নেই এবং ধর্মমত যে নেহাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা দেশের জনসাধারণকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং এই বুঝাইয়া দিবার ভার তাদেরই নেওয়া ভালো যারা প্রচলিত সবকটি ধর্মমতের অন্তঃসারকূন্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়া আছে। পল্লীতে পল্লীতে তারা দেশের সভ্যতা রূপের বার্তা পৌঁছাইয়া দিবে। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত তারাই তাদের এই বার্তার প্রসারের মধ্যে দিয়া করিবে।[৫০]

মার্কসীয় চিন্তার আলোকে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় একটি সমাধানের পথ চিহ্নিত করেছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। যেখানে তিনি সমাজের আর্থিক বৈষম্যকে দূরীকরণ করতে চেয়েছেন।

> এই সমস্যা সমাধানের আরেকটি উপায় হচ্ছে ইকোনোমিক সমস্যা সমাধান। এই অন্ন বস্ত্রের সমস্যায় আমাদের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। যতদিন দেশ রাষ্ট্রের দিক হইতে সাধারণ সত্ববাদ স্বীকার না করিতেছে যতদিন পরশ্রম - উৎপন্নভোগী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সমাজ হইতে বিলুপ্ত না হইতেছে ততদিন এই সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই এই শ্রেণীগত ও সাম্প্রদায়গত সংঘাত চলিতেছে, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষের এই উপরিউক্ত কারণ ব্যতীরেকে ও আরো দুই একটি কারণ আছে। ভারতবর্ষের বর্তমান পরাধীন অবস্থা, তার মধ্যে অন্যতম।[৫১]

নবম পৃষ্ঠায় সোশ্যালিজম সম্পর্কে আর নেফট বলেন - অর্ধ সভ্য অবস্থায় ঊর্ধ্বতম স্তরে মানুষের মনের উন্নয়নকেই ধনিকবাদ নামে অভিহিত করা হয়। সোশ্যালিজম হচ্ছে মানুষের উন্নত মন। এই অবস্থায় আর্ট সমস্ত সমাজের সুবিধার জিনিষে পরিণত হয়। শোষণবৃত্তি সেখানে পরিসমাপ্তি হয়, আর সভ্যতারও শুরু হয় সেখানে।[৫২] এর পাশাপাশি বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির দুইজন সদস্য অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাগার থেকে মুক্তির খবর আনন্দের সাথে প্রকাশ করা হয়েছিল। দশম পৃষ্ঠায় আফতাব আলীর 'ভারত কি চায়' প্রবন্ধে শ্রমিক-কৃষকের উপরে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আহ্বান জানান হয়।

১৮ই মার্চ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দ্বাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'জেলেদের গান'। 'জেলেদের গান' কবিতাটি শ্রমজীবী জেলে সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত। কবিতায় তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা এবং প্রকৃতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। এখানে জেলেদের গান শুধু বিনোদন নয় বরং তাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই গানে ঝড়-তুফানের সঙ্গে লড়াই, জীবনের অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, আশা ও সাহসের কথা প্রকাশিত হয়। ছয় নম্বর পৃষ্ঠায় মুজফ্ফর আহ্মদের 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ভারতের গণ-আন্দোলন আদতেই কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন। এই আন্দোলন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরে শুরু হলেও এর মূল শক্তি এসেছে কৃষক- শ্রমিকের মধ্যদিয়ে। কিন্তু মুষ্টিমেয় এই শ্রেণি বারবার কৃষক- শ্রমিকদের উপেক্ষা করেছে। কংগ্রেস ও গান্ধীজীর সমালোচনা করে চৌরিচৌরা ও মালাবার কৃষকদের প্রতি তাঁদের মনোভাবকে তীব্র নিন্দা করেছেন। স্বাধীনতা সমরের পতাকা তিনি কৃষক ও শ্রমিকের হাতে তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর কাছে মুক্তির সংগ্রাম হল মূলত শ্রমিক ও অ-শ্রমিকের সংগ্রাম। সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের এই বঞ্চনার কারণ হিসাবে তিনি শিক্ষা ও নিরক্ষতাকে দায়ী করেছেন। তবে তিনি আশা রেখেছেন কৃষক - শ্রমিকের জাগরণের। তাই লিখেছেন -

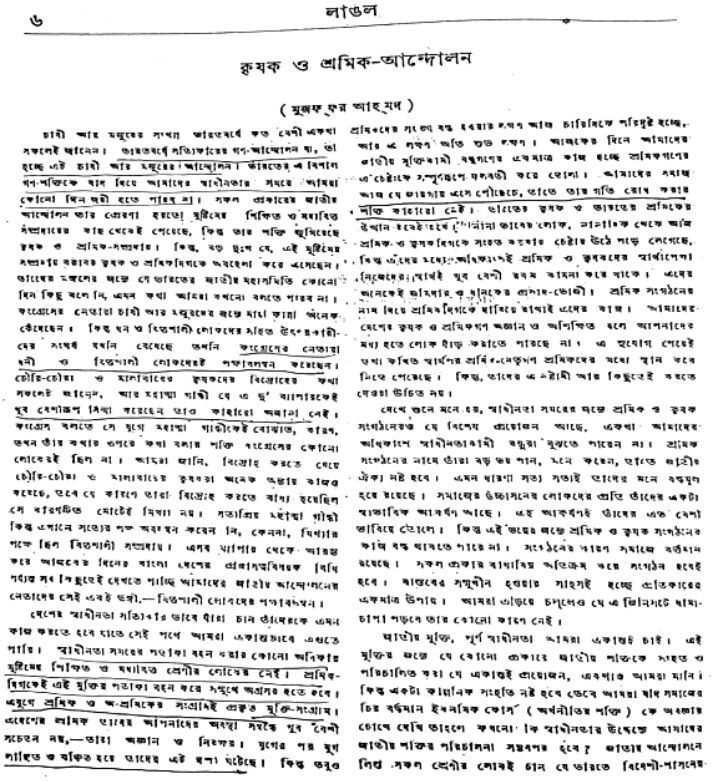

ধর্মঘট আর বিদ্রোহের দ্বারা তারা তাদের দাবি-দাওয়া বুঝে নিতে চায়। এর জন্য কৃষক ও শ্রমিকরা সঙ্গবদ্ধ হবে, তাদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নেয় তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তাদের দাবি যতদিন না পূর্ণ হবে, যতদিন বিদেশি শোষণ-শাসনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন আমাদের শ্রমিক ও কৃষকগণই আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম চালাবে কিন্তু তাদিগকে জাগাবার জন্যে, সচেতন করবার জন্য, তাদের সংহত শক্তির পরিচালনার জন্য, তাদের উপস্থিত শ্রেণীগত স্বার্থটা মেনে নিতেই হবে। কৃষক ও শ্রমিকের সংগঠন ভারতের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সংগঠন। তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে যারা ভুল বুঝেন তারা কিছুই বোঝেন না।[৫৩]

৬ লাঙল

কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন

(মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

চিত্র ৭: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ‘কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলন’।

এই সংখ্যার সাত পৃষ্ঠায় কার্ল মার্কসের ‘ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের একটি চিত্র’ নামের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, শিল্প বিপ্লবের পর ভারতে অবশিল্পায়ন, কৃষির সংকটসহ আপামর জনসাধারণের জীবনের বিপর্যয়কে তিনি তুলে ধরেছিলেন।

> “ইংরেজ ভারতে এসে তাঁত আর চরকার সর্বনাশ করল ইংরেজ ইউরোপের বাজার থেকে ভারতজাত বস্ত্রকে নির্বাসিত করল। তারপরে ভারতবর্ষে বিদেশি সুতা চালান করে এমনকি তুলোর জন্মভূমি এই ভারতে বিদেশ থেকে তুলো আমদানি করে ভারতবর্ষের বাজার তখন করল। .....ইংল্যান্ডের বাষ্পবল আর বিজ্ঞানবল, ভারতবর্ষের সর্বত্র কৃষির সঙ্গে কুটির শিল্পের যে যোগ ছিল তা একেবারে নির্মূল করল”।[৫৪]

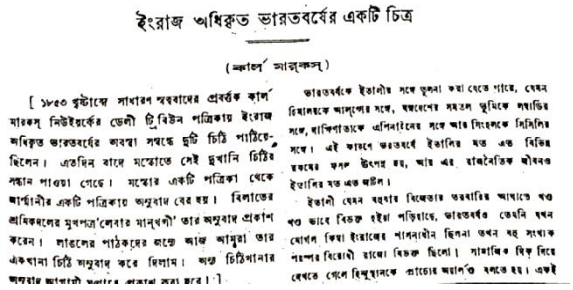

ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের একটি চিত্র

(কার্ল মারক্‌স্)

[১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সাধারণ স্বত্ববাদের প্রবর্তক কার্ল মারক্‌স্ নিউইয়র্কের ডেলী ট্রিবিউন পত্রিকায় ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে দুটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এতদিন বাদে মস্কোতে সেই দুখানি চিঠির সন্ধান পাওয়া গেছে। মস্কোর একটি পত্রিকা থেকে জার্মানীর একটি পত্রিকায় অনুবাদ বের হয়। বিলাতের শ্রমিকদলের মুখপত্র 'লেবার মান্থলী' তার অনুবাদ প্রকাশ করেন। লাঙলের পাঠকদের জন্যে আজ আমরা তার একখানা চিঠি অনুবাদ করে দিলাম। অন্য চিঠিখানার অনুবাদ আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।]

ভারতবর্ষকে ইতালীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যেমন হিমালয়কে আল্পসের সঙ্গে, বঙ্গদেশের সমতল ভূমিকে লম্বার্ডির সঙ্গে, দাক্ষিণাত্যকে এপিনাইনের সঙ্গে আর সিংহলকে সিসিলির সঙ্গে। এই কারণে ভারতবর্ষে ইতালির মত এত বিভিন্ন রকমের ফসল উৎপন্ন হয়, আর এর রাজনৈতিক জীবনও ইতালির মত এত জটিল।

ইতালী যেমন বহুবার বিজেতার তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষও তেমনি যখন মোগল কিম্বা ইংরাজের শাসনাধীন ছিলনা তখন বহু সংখ্যক পরস্পর বিরোধী রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। সামাজিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে হিন্দুস্থানকে প্রাচ্যের আয়ার্লণ্ড বলতে হয়। একই

চিত্র ৮: লাঙল পত্রিকায় প্রকাশিত কার্ল মার্কসের 'ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের একটি চিত্র'।

লাঙলের ত্রয়োদশ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৫শে মার্চ। এই সংখ্যায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের 'কারাগার সম্বন্ধে দেশের ঔদাসীন্য' প্রবন্ধে কারাগারবন্দীদের কারাগারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, খাদ্য ও জীবনের হতাশার বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। জেলে বন্দী মানুষও যে মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করে তা প্রবন্ধের মধ্যদিয়ে পাঠকের কাছে এই বার্তা দিতে চেয়েছেন।

"নানা প্রকারের লোক নানা কারণে জেলে গিয়ে থাকে। অনেকে অপরাধ করেও যায় আবার অনেক নিরাপরাধকেও পাকে চক্রে পড়ে জেলে যেতে হচ্ছে। অপরাধ রাত-দিন দেশে কত লোকেই না করছে সকলে কিন্তু ধরা পড়ে না। ধরা যারা পড়েনি তারা আর দশ জনের সঙ্গে দিব্য ভালো মানুষের মতো চলে যাচ্ছে। তাদের কে কোন কথা বলার শক্তি কাহারো নেই। অথচ যারা জেলে গিয়েছে তাদেরই প্রতি যত প্রকারের অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু এমনটি আর হতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আমি অপরাধ করেছি বলে তুমি আমাকে আমার প্রিয়তম বস্তু স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করেছ, কিন্তু আমার কাছ থেকে আমার মনুষ্যত্ব কেড়ে নেবার কি অধিকার রয়েছে তোমার?

জেলে যারা যায় তারা মানুষ আমাদের দেশের লোক পরম আত্মীয় তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এতগুলো লোককে এই যে পশুতে অবনমিত করা হচ্ছে এতে দেশের খুব বেশি ক্ষতি হচ্ছে। এতদিন আমরা জেলের দিকে তাকিয়ে দেখিনি, না দেখে পাপ করেছি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনই আমাদের করা চাই"।[৫৫]

নবম পৃষ্ঠায় কার্ল মার্কসের 'ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল্যায়নের বিষয়ে তিনি লেখেন -

"ভারতবর্ষে ইংরেজের দুটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে একটি হচ্ছে ধ্বংস মূলক কার্য। একটি হচ্ছে এশিয়া সামাজিক জীবনের মূল নষ্ট করা আরেকটি হচ্ছে পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনকে ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ....ইংরেজ ভারতীয় সভ্যতাকে বিধ্বস্ত করলে ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর ছিল তাকে বিনষ্ট করে আর দেশের শিল্পকে নষ্ট করে। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস ধ্বংসের ইতিহাসের নামান্তর বলা যেতে পারে। সেই ধ্বংসস্তূপ এর মধ্য থেকে এখনো পর্যন্ত নবজীবনের কোন সূচনা দেখা যাচ্ছে না"।[৫৬]

মার্কস সংগ্রামের অনিবার্যতা সম্পর্কে লেখেন -

"উরোপের মতই বৃহৎ এই ভারতবর্ষে ইংরেজের বাণিজ্য প্রথা যে সর্বনাশ সাধিত করেছে তা যেমন সুস্পষ্ট তেমনি ভয়ঙ্কর। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে এই বাণিজ্য প্রথা বর্তমান কালের উৎপাদন প্রণালীর ফল মাত্র। এই উৎপাদন প্রণালীর মূলে ধনিকতন্ত্রের অপ্রতিহত যথেচ্ছাচার লুকায়িত আছে। সজ্ঘবদ্ধদের উপরেই এই ধনিকতন্ত্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্ভর করে। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ধনিকতন্ত্র যে সর্বনাশ ঘটিয়েছে তা বর্তমান সভ্য জগতে প্রত্যেক শহরে যে অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত তার থেকেই প্রতিয়মান হবে।

ইতিহাসের পর শ্রম উৎপন্ন ভোগী দলের যুগ পৃথিবীতে নবযুগের প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। একদিকে তারা পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে বাণিজ্য সূত্রে গ্রথিত করবে অন্যদিকে উৎপাদন শক্তির আর প্রকৃতির শক্তির উপরে মানুষের ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ঘটাবে"।[৫৭]

৮ই এপ্রিলে প্রকাশিত লাঙলের চতুর্দশ সংখ্যায় মুজফ্ফর আহ্মদের 'খোলা চিঠি' শিরোনামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে সমকালীন সমাজ, রাজনীতি অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়। তিনি প্রচলিত কংগ্রেস ও গান্ধীজীর রাজনীতির বিরোধিতা করে লিখেছেন -

"ইকনোমিক ফোর্স বা অর্থনৈতিক শক্তি নামক একটি জিনিস যে সমাজের প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে তোমাদের মহাত্মা গান্ধী তার প্রতি খুব বেশি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন এবং আজও করছেন। খোলা চিঠি কিন্তু বাস্তব জিনিস যা তাকে যদি আমি এড়িয়ে চলি তাতে কি তার সত্তা বিলোপ পেয়ে যাবে? অভাবের পীড়নে দেশের জনসাধারণের অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হয়ে উঠেছে মহাত্মা গান্ধী তা তার প্রাণে অনুভব করেছেন এবং তারই জন্য তিনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ভোগের মাত্রা কমাতে। .....প্রত্যেক পরিবার সুতো কাটবে আর হাতের তাতে কাপড় বুনবে এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। লাভলুপতা সমাজে অব্যাহত ভাবে বর্তমান রয়েছে, আর রয়েছে বলেই এত বক্তৃতা ও আন্দোলন সত্ত্বেও গান্ধীজীর ইচ্ছা অনুযায়ী খদ্দেরের প্রচলন দেশে হয়নি। ব্যবসায় চালিয়ে দশ জনকে শোষণ করে একজনের বড় হবার প্রথা যতদিন না রাষ্ট্র অবৈধ বলে নিরূপণ করছে ততদিন কিছুতে শোষণ বৃদ্ধির সমাপ্তি হবে না"।[৫৮]

সপ্তম পৃষ্ঠায় নজরুলের 'সর্ব্বহারা' কবিতাটি এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই কবিতায় শোষিত, নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দরিদ্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে তাদের বিদ্রোহ ও মুক্তির প্রত্যয়। কবিতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সেই মানুষগুলো, যারা নিজেদের পরিশ্রম, ঘাম, রক্ত দিয়ে সমাজ গড়ে তোলে, অথচ বিনিময়ে কিছুই পায় না। ধনী-শোষক শ্রেণি তাদের শোষণ করে, তাদের শ্রম লুণ্ঠন করে, অথচ তারাই বঞ্চিত থাকে মৌলিক অধিকার থেকে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে নজরুল তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে কবিতাটি কেবল হতাশা আর বঞ্চনার গল্প নয়, বরং এটি এক জাগরণের ডাক। নজরুল এখানে নিপীড়িতদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, বিদ্রোহের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, সর্বহারারা একদিন শৃঙ্খল ভেঙে নিজেদের মুক্তি ছিনিয়ে আনবে। 'সর্বহারা' তাই শুধু দুঃখগাথা নয়, এটি এক প্রতিবাদ, এক বিপ্লবের গান। এটি শোষিত মানুষের কণ্ঠস্বর, যা সমাজ পরিবর্তনের জন্য উচ্চারিত হয়েছে।

মাঝিরে তোর নাও ভাসিয়ে মাটির বুকে চল
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক রক্ত পদতল
প্রলয় পথিক চলবি ফিরি
দলবি পাহাড় কানন গিরি
হাঁকছে বাদল ঘিরি ঘিরি
নাচছে সিন্ধু জল
চল রে জলের যাত্রী এবার মাটির বুকে চল।[৫৯]

অষ্টম পৃষ্ঠায় জায়গা করে নিয়েছিল সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যুগ-সন্ধিক্ষণ' প্রবন্ধটি। এখানে তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করে বলেছেন -

"স্বীকার করতেই হবে যে কংগ্রেসের সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস যাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে এসেছে তারা হচ্ছে ধনিক, বণিক আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গত। চল্লিশ বছর ধরে জাতির নামে কংগ্রেস যত কিছু দাবি করেছে সবই এই ধনিক বণিক আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য, আর যে সব অন্যায়ের প্রতিকার প্রার্থনা করেছে সেও এই উপরি উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত স্বার্থকে বিদেশী শাসনতন্ত্রের ক্রমিক সম্প্রসারণের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টায়"।[৬০]

এই সংখ্যাতেই 'বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন' - এর প্রতিষ্ঠা ও দাবি-দাওয়াগুলি নিয়ে একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। কলকাতার দাঙ্গার মত সংবেদনশীল খবরও প্রকাশিত হয়। এছাড়াও সোশ্যালিজম কাকে বলে এই নিয়ে শ্রীসুরেশ বিশ্বাসের একটি সঙ্কলন বের হয়। বলা বাহুল্য রাজনৈতিক এই খবর ও বিষয়গুলি পাঠককে বিকল্প চিন্তার জগতে আহ্বান জানিয়েছিল।

পঞ্চদশ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২রা বৈশাখ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সংখ্যাটি ছিল লাঙলের শেষ সংখ্যা। এই সংখ্যার প্রথমেই চণ্ডীদাসের কবিতা দিয়ে শুরু করা হয়। যেখানে লেখা ছিল -

শুনহ মানুষ ভাই -
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।[৬১]

লাঙলের তিন নম্বর পৃষ্ঠায় মুজফ্ফর আহ্মদের 'ধম্ম ও রাষ্ট্র' নামাঙ্কিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রবন্ধে মুজফ্ফর আহ্মদ ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সমাজে ধর্মের ভূমিকা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মের ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। এটি মূলত একটি সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক রচনা, যেখানে লেখক ধর্মের প্রকৃতি, তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভূমিকা এবং এর রাজনৈতিক ব্যবহারের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধটিতে মুজফ্ফর আহ্মদ দেখিয়েছেন কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্ম কখনো সহায়ক ভূমিকা পালন করে, আবার কখনো ক্ষমতাশালী শ্রেণির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়, তবে রাষ্ট্র যখন এটিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে, তখন তা বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে।

> "ধর্ম আর রাষ্ট্রকে একই ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা বারবার চলে এসেছে বলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রশক্তি আজও মুক্ত হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্র হতে আরম্ভ করে অরবিন্দ, গান্ধী, আবুল কালাম ও মোহাম্মদ আলী প্রত্যেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই একই ভুল করেছেন। একটা অভিনব জাতীয় জাগরনের ভারতবাসীর প্রাণে জাগিয়ে দিয়েছেন বলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে ভারতবর্ষ ঋণী কিন্তু তবুও নিতান্ত দুঃখের সহিত বলতে হবে যে তার মিশন এদেশে কৃতকার্য হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের বাণী প্রচার করেছেন অথচ সমদৃষ্টে সকলকে দেখতে পারেননি। তার সাধনা কেবলমাত্র হিন্দুকে নিয়েই যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় উপড়ন্তু অহিন্দুর প্রতি তা হতে হিন্দুর প্রাণী একটা বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে। এই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াতে দেশের ও দশ এর কম ক্ষতি সাধিত হয়নি। ফলে এই যে বঙ্কিমের ন্যায় এত বড় একটা শক্তি সম্পন্ন লোকের কাছ থেকে এ দেশের জন সাধারণ যা পেতে পারতো তার একটা ভুলের জন্য তার শতাংশেরও এক শতাংশ তারা পায়নি"।[৬২]

চতুর্দশ পৃষ্ঠায় নির্যাতন, বিপ্লব ও তাহার প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়, যেখানে নির্যাতন, বিপ্লব দাবানল জ্বালাইয়া তোলে, আবার বিপ্লব হইতেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পতন। একের পর আর এমনি করিয়া অগ্নিচক্র ঘুরিতেছে। ইতিহাসে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। বিপ্লবের স্বপক্ষে এই বাণী বেশ প্রাসঙ্গিক। এই সংখ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সতেরো পৃষ্ঠায় বলশেভিক ষড়যন্ত্রের অভিযুক্তদের পক্ষে খবর প্রকাশ। পত্রিকায় খবরটি আসে এই ভাবে -

> "কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্রের মোকদ্দামায় মোজাফ্ফর আহ্মেদ, নলিনী, শওকত উসমানী ও ডাঙ্গের চার বছরের সশ্রম কারাবাসের হুকুম হয়েছিল। তাদের অপরাধ এই ছিল যে তাঁরা দেশের সম্বন্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ধনী নির্ধন একই প্রকার সুখে জীবন কাটাবে। তাদের মধ্যে একজন অভিযুক্তও এ প্রদেশের অধিবাসী নন। এইজন্য জলবায়ু অনুকূল না হওয়ায় জেলে তারা পিড়া গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নলিনি আর মুজফ্ফর আহ্মদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। সরকার পক্ষ থেকে

তাঁদের বাঁচবার জন্যে তাঁদের দুজনকে ছেড়ে দিয়েছেন। অবশিষ্ট দুজন অভিযুক্ত আজকাল জেলে খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। শওকত ওসমানীর শরীরে মাংস বলতে কোন জিনিস নেই, কেবলমাত্র অস্থি পাঁজরে অবশিষ্ট রয়েছে। অন্যতম ডাঙ্গেকে সিতাপুর জেলে রাখা হয়েছে। তার অবস্থা শোচনীয়। এদের দুজনকে কাহারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয় না। কানপুর মজদুর সভার শ্রীযুক্ত রহমান আলী এদের দুজনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কয়েকবার জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি বানপুর মজদুর সভার বার্ষিক অধিবেশনে এক প্রস্তাব পাস করে সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যে, এ বীর যোদ্ধাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। এ প্রস্তাব গভর্নমেন্টকে পাঠানো হয়েছে। সরকারের উচিত নলিনী আর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ন্যায় এ-দুজন কয়েদিকে ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বর না করুক যদি সজ্জন লোক জেলে মরে যান তাহলে সরকারের নামে যে কলঙ্কের ছাপ পড়বে তা আর কখনো মিটবে না। আমাদের এসেম্বলি ও প্রাদেশিক আইনসভায় মেয়রদিককেও অনুরোধ করা হইতেছে যে, তারা রোগ শয্যায় শায়িত দুজন অভিযুক্তকে ছাড়াবার যথাশক্তি চেষ্টা করুন"।[৬৩]

উপসংহার

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা একটি যুগান্তকারী অধ্যায়, যা রুশ বলশেভিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠে, শুধুমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে নয়, বরং সমাজের গভীরতম শ্রেণী বৈষম্য, কৃষক-শ্রমিকের শোষণ এবং সাম্যবাদী দর্শনের প্রচারে এক নতুন দিশা প্রদান করেছিল। এই আন্দোলনের প্রাথমিক ধাপে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যিনি কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় ছাড়িয়ে একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে উঠে এসেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত লাঙল পত্রিকা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে 'ওয়ার্কার্স এন্ড পিজেন্টেস পার্টি'র সাথে যুক্ত হয়, এটি অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিটি মতাদর্শের প্রথম প্রকাশ্য প্রচার মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই পত্রিকার মাধ্যমে নজরুল শুধুমাত্র মার্কসবাদী সাহিত্যের অনুবাদ নয়, এর সাথে শ্রেণি সংগ্রামের আলোচনা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তীব্র সমালোচনাও করেছিলেন। পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষকের অধিকার, সামাজিক বৈষম্যের অবসান এবং বিপ্লবী চেতনার প্রচারের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কবিতার মধ্যদিয়ে। লাঙল পত্রিকার সম্পাদকীয় রচনা এবং প্রবন্ধগুলি জনসাধারণকে রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেছে যা বাংলার বামপন্থী রাজনীতির ভিত্তি স্থাপনে অমূল্য ভূমিকা পালন করেছে।

যদিও নজরুল কখনো কমিউনিস্ট পার্টির অনুষ্ঠানিক সদস্য ছিলেন না। তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা এবং লাঙলের মাধ্যমে প্রচারিত মতাদর্শ কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার যুগে একটি সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে গঙ্গাধর অধিকারীর উদ্ধৃতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক - "Langal reflects that early period of the history of the communist party in Bengal when it's pioneers were turning to practical work of organising peasants and workers, when they are just beginning the mass popularization of Marxism- Leninism and scientific socialism and the experience of the October socialist revolution; when it is drawing support from the left wing of the national movement particularly of the Swaraj Party."[৬৪] এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে লাঙল শুধুমাত্র একটি পত্রিকা ছিল না। বরং বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথমকালীন ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল যা শ্রমিক-কৃষকের সংগঠন মার্কস-লেনিনের দর্শনের প্রচার এবং জাতীয় আন্দোলনের বামপন্থী অংশের সাথে যোগসূত্র স্থাপনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। নজরুলের লাঙলের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যিক তীক্ষ্ণতা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অনন্য সমন্বয়ে ঘটিয়েছেন, যা অহিংসা ভিত্তিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিকল্প হিসেবে বিপ্লবী পথের সমর্থন করেছে।

সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করলে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম এবং লাঙল পত্রিকা বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের একটি অনিবার্য অংশ হিসেবে স্থান লাভ করেছে। এটি শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে একত্রিত করতে সাহায্য করেছে তাই নয় বরং জনসাধারণের মধ্যে সাম্যবাদী চেতনার বীজ বপন করেছে, যা পরবর্তীকালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা মিরাট মামলা এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশে প্রভাব ফেলেছে। তবে এরও সীমাবদ্ধতা আছে। পত্রিকাটির স্বল্পকালীন ছিল এবং ব্রিটিশ দমননীতির কারণে তার প্রভাব পুরোপুরি বিস্তার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু নজরুলের এই প্রয়াস বাংলা রাজনৈতিক দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে, যা আজও শ্রমিক-কৃষকের মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস। এই আন্দোলনের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, সাহিত্য এবং রাজনীতির সমন্বয় কিভাবে সমাজ পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

তথ্যসূত্র:

১ Gangadhar Adhikari, ed., *Documents of The Commuinist Party of India*, Vol.I, 1917-1922 (New Delhi: People's Publishing House, 1972), 20-24.

২ Gangadhar Adhikari, ed., *Documents of The Commuinist Party of India*, 20-24.

৩ মর্তুজা খালেদ, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের বিকাশধারা এবং রাজশাহী জেলা*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০২২), ১৯।

৪ মুজফ্ফর আহ্মদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০), ৫৪-৫৫।

৫ ভানুদেব দত্ত, *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপট : ভারত* (কলকাতা: মনীষা, ২০১৫), ২০।

৬ Sumit Sarkar, *Modern India: 1885-1947* (Kolkata: Mackmilan India Limited, 1983), 213.

৭ Panchanan Sha, *History of the Working Class Movementing Bengal* (New Delhi: Peoples Publishing House, 1978), 70.

৮ অমিতাভ চন্দ্র, *অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের: সূচনাপর্ব* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), ৩।

৯ মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ), ২৮।

১০ আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের রূপরেখা* (ঢাকা: পড়ুয়া প্রকাশনী, ১৯৯৭), ১১-১২।

১১ অমিতাভ চন্দ্র "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", *রাজনীতির নজরুল*, সম্পা. অরুণাভ ঘোষ (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১), ১৩৯।

১২ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", ১৪০।

১৩ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", ১৪৫।

১৪ মুজফ্ফর আহমদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬০), ৫৪-৫৫।

১৫ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", *রাজনীতির নজরুল*, সম্পা. অরুণাভ ঘোষ, (কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১), ১৪৬।

১৬ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", ১৪৭।

১৭ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", ১৫৬।

১৮ David Petrie, *Communism in India 1924-1927* (Kolkata: Ghatak, 1972), 128.

১৯ অমিতাভ চন্দ্র, *অবিভক্ত বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের: সূচনাপর্ব* (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯২), ৫।

২০ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", *রাজনীতির নজরুল*, সম্পা. অরুণাভ ঘোষ, (কলকাতা:প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০১), ১৫৮।

২১ অমিতাভ চন্দ্র, "ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম", ১৫৭।

২২ ড. রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী* (ঢাকা: বাংলা একাদেমি, ১৯৮৬), ২৮৪।

২৩ *লাঙল*, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৬, ১৯২৫, ১।

[২৪] *লাঙল*, প্রথম সংখ্যা, ৩।
[২৫] *লাঙল*, প্রথম সংখ্যা, ১।
[২৬] নজরুল ইসলাম, "সাম্যবাদী", *লাঙল*, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৬, ১৯২৫, ৫।
[২৭] নজরুল ইসলাম, "সাম্যবাদী", ৫।
[২৮] নজরুল ইসলাম, "সাম্যবাদী", ৮।
[২৯] ডঃ রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী* (ঢাকা: বাংলা একাদেমি, ১৯৮৬), ২৮৪।
[৩০] *লাঙল*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২৩, ১৯২৫, ১১।
[৩১] গিরিজাকান্ত মুখোপাধ্যায়, "মাটীর মোহ", *লাঙল*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২৩, ১৯২৫, ১১।
[৩২] নজরুল ইসলাম, "কৃষাণের গান", *লাঙল*, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২৩, ১৯২৫, ৪।
[৩৩] নজরুল ইসলাম, "কৃষাণের গান", ৪।
[৩৪] *লাঙল*, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী, ৭, ১৯২৬, ৩।
[৩৫] নজরুল ইসলাম, "সব্যসাচী", *লাঙল*, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী, ৭, ১৯২৬, ৪।
[৩৬] *লাঙল*, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী, ৭, ১৯২৬, ৯।
[৩৭] *লাঙল*, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৪, ১৯২৬, ১৩।
[৩৮] মুজফ্ফর আহম্দ, "ভারত কেন স্বাধীন নয়?", *লাঙল*, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৪, ১৯২৬, ৫।
[৩৯] মুজফ্ফর আহম্দ, "ভারত কেন স্বাধীন নয়?", ৫।
[৪০] লাঙল, পঞ্চম সংখ্যা, মাঘ, ৭, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪।
[৪১] মুজফ্ফর আহম্দ, "কমিউনিস্ট পার্টি গঠন", *লাঙল*, পঞ্চম সংখ্যা, মাঘ, ৭, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫।
[৪২] মুজফ্ফর আহম্দ, "কোথায় প্রতিকার", *লাঙল*, ষষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ, ১৪, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৯।
[৪৩] মুজফ্ফর আহম্দ, "কোথায় প্রতিকার", ১১।
[৪৪] নজরুল ইসলাম, "শ্রমিকের গান", *লাঙল*, নবম সংখ্যা, ফাল্গুন, ৬, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৪।
[৪৫] নজরুল ইসলাম, "শ্রমিকের গান", ৪।
[৪৬] নজরুল ইসলাম, "শ্রমিকের গান", ৪।
[৪৭] *লাঙল*, দশম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৩।
[৪৮] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান", *লাঙল*, একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন, ২০, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৭।
[৪৯] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান", ৮।
[৫০] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান", ৮।
[৫১] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান", ৮।
[৫২] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "হিন্দু-মুসলমান", ৯।
[৫৩] মুজফ্ফর আহম্দ, "কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন", *লাঙল*, দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র, ৪, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৬।
[৫৪] *লাঙল*, দ্বাদশ সংখ্যা, চৈত্র, ৪, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৯।
[৫৫] মুজফ্ফর আহম্দ, "কারাগার সম্বন্ধে দেশের ঔদাসীন্য", *লাঙল*, এয়োদশ সংখ্যা, চৈত্র, ১১, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৯।
[৫৬] *লাঙল*, এয়োদশ সংখ্যা, চৈত্র, ১১, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ১০।
[৫৭] *লাঙল*, এয়োদশ সংখ্যা, ১২।
[৫৮] মুজফফর আহমেদ, "খোলা চিঠি", *লাঙল*, চতুর্দশ সংখ্যা, চৈত্র, ২৫, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৪।
[৫৯] নজরুল ইসলাম, "সর্ব্বহারা", *লাঙল*, চতুর্দশ সংখ্যা, চৈত্র, ২৫, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৭।
[৬০] সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, "যুগ-সন্ধিক্ষণ", *লাঙল*, চতুর্দশ সংখ্যা, চৈত্র, ২৫, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, ৮।
[৬১] *লাঙল*, পঞ্চদশ সংখ্যা, বৈশাখ, ২, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩।
[৬২] মুজফ্ফর আহম্দ, "ধর্ম্ম ও রাষ্ট্র", *লাঙল*, পঞ্চদশ সংখ্যা, বৈশাখ, ২, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩-৪।
[৬৩] *লাঙল*, পঞ্চদশ সংখ্যা, বৈশাখ, ২, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৭।
[৬৪] Gangadhar Adhikari, ed., *Documents of the History of the Communist Party of India*, Vol.III-C, 1928 AD, (New Delhi: People's Publishing House, 1982), 75.